মর্যাদা বা dignity[1] এই গবেষণার মূল ভরকেন্দ্র। টেকসই উন্নয়নের জন্য যা যা প্রয়োজন— ন্যায়পরায়ণ প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা ইত্যাদি— সবকিছুরই মূলে রয়েছে মর্যাদা। মর্যাদার ওপর মনোযোগ দেয়াতে অভাবী মানুষের 'নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি'ও সামনে চলে এসেছে। গবেষণায় উঠে এসেছে, একটি 'সুন্দর জীবন' বলতে রোহিঙ্গারা ঠিক কী কল্পনা করে অথবা তারা কেমন করে একটি ইতিবাচক ও টেকসই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, যে ভবিষ্যতে তাদের কল্যাণ নিহিত। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী (IDP) এবং মায়ানমারের রাখাইনের রোহিঙ্গাদের অভিজ্ঞতা নিবিড়ভাবে অবলোকন করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রে বাংলায় dignity কে মর্যাদায় রূপান্তর করা হলেও রোহিঙ্গাদের বেলায় 'মান-সম্মান' এবং আফগানিস্তানের প্রেক্ষাপটে 'ইজ্জত' শব্দগুলো যুতসই অনুবাদ। তাদের নিজস্ব বাসস্থান থেকে শরণার্থী শিবির পর্যন্ত এই মান-সম্মান কিংবা ইজ্জতের কতটা ওঠানামা হয়েছে সেটাও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে করে যে সব ফলাফল পাওয়া গিয়েছে তা নিম্নরূপ—

(১) মানুষ কীভাবে বাস্তুচ্যুত হয় আর সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যায় সে ব্যাপারে গবেষণায় আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

(২) এই বাস্তুহারা জনগোষ্ঠী এবং বিশ্বের অন্যান্য জায়গার সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুত ও শরণার্থী সমাজকে টিকিয়ে রাখতে আরো ন্যায্য ও মর্যাদাপূর্ণ সহযোগিতা কী করে দেয়া যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞানকাণ্ডভিত্তিক চর্চা হয়েছে।

(৩) তাদের সুস্থ ও নিরাপদ জীবনধারণের জন্য (স্বল্পমেয়াদী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী) বাস্তবসম্মত সমাধান কি কি হতে পারে সেগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

(৪) তাদেরকে নিজ ভূমিতে ফিরিয়ে নেয়া, অন্য কোথাও স্থানান্তর করা অথবা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথেই খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ কি কি হতে পারে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

বাস্তুচ্যুতির সংগ্রাম

গবেষণার ফল বলে, অভ্যন্তরীণ বাস্তুহারাদের (IDP) ঘরছাড়া হবার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যদিও বেশিরভাগের বেলায় কারণটা হচ্ছে যুদ্ধ ও সংঘাত, তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দারিদ্র্যও কিছু ক্ষেত্রে দায়ী। স্থানান্তরের আগে ও পরে এই 'সংঘাতের-দরুণ-বাস্তুহারা' মানুষেরা প্রচণ্ড নির্মমতার স্বীকার এবং তাদের মনে একটি ক্ষত তৈরি হয়েছে। অনেকের পক্ষেই আর

[1] এই গবেষণা সারমর্মে ডিগনিটি (Dignity) এর সরল বাংলা হিসেবে 'মর্যাদা' কে বিবিচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মর্যাদার সমার্থক শব্দ হিসেবে মান-সম্মানকেও বিবেচনা ও ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে আফগানিস্তানের প্রেক্ষাপটে 'ইজ্জত' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েচে মর্যাদাকে বোঝার জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ রোহিঙ্গা ও আই ডি পি (IDP) দের প্রেক্ষাপটে মর্যাদাকে বোঝার জন্য এই সকল শব্দ বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

ভিটেমাটিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সেখানে সংঘাত এখনও চলমান। অর্থাৎ বহু মানুষ দীর্ঘ সময়ের জন্য বাস্তুহারা হয়েছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভাষ্যমতে, মিয়ানমারে তাদেরকে একটি সম্মানের জীবন থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিলো। তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ছিল না। ছিল না চলাফেরার স্বাধীনতা, শিক্ষার অধিকার কিংবা সনদের ব্যবস্থা। বিয়ের অধিকার বা রেজিস্ট্রি করার সুযোগ ছিল সীমিত। তাদের বাড়ির আঙিনায় দেয়াল তোলা ছিল নিষেধ তাই নারীদের সম্মানরক্ষাও ছিল কঠিন। বহু বছর ধরেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক 'বর্ণবাদ' ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে যার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি নানা প্রকার নির্যাতনে— যেমন যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, নিদারুণ প্রহার, জমিদখল ইত্যাদি। ২০১৭ সালে এই অত্যাচারে বাধ্য হয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। সে বছর 'ক্লিয়ারেন্স অপারেশন' ছিলো মিয়ানমার মিলিটারি পরিচালিত একটি নিয়ন্ত্রিত হামলা। তবে স্থানীয় 'মগ' বৌদ্ধরাও এতে জড়িত ছিলো। অপারেশনের ফলাফল ছিলো গণহত্যা, নির্যাতন, রোহিঙ্গা গ্রামে রেইড/হামলা, পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া, নারীর প্রতি সহিংসতা (এমনকি যৌন সহিংসতা ও অঙ্গহানি)। মিলিটারি ও মগ'রা মিলে তাদের হামলা করে ও তাড়া করে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে আসে আর নিশ্চিত করে যে, তারা আসলেই সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চূড়ান্ত নির্যাতন, দারিদ্র্য ও নির্মমতার স্বীকার হয়েও IDP ও রোহিঙ্গাদের অনেকেরই মতে, তাদের মান-সম্মান বা ইজ্জত ছিল অক্ষুন্ন। সম্ভবত তারা বুঝিয়েছে অন্তর্নিহিত মর্যাদার কথা— যা তাদের মানসিক শক্তি জোগায়। আর যাদের ধারণা মর্যাদার হানি হয়েছে, তারা ভেবেছে সামাজিক মর্যাদার কথা এবং অবশ্যই তারা সমাজে মূল্য হারিয়েছে (Kateb, 2011)। যদিও IDP ও রোহিঙ্গারা এই অন্তর্নিহিত মর্যাদা থেকে সামাজিক পরিচয় ও দৃঢ়তার শক্ত এক ভিত্তি পায়, তবু বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে, এই নির্যাতন ও স্থানান্তরের কারণে তাদের মানুষ হিসেবে মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। IDP রা বলেছেন, তাদের 'কারামা' (আরবিতে উচ্চ মর্যাদা, সম্মান, শ্রদ্ধা; দেখুন Kandiwall, 2019), 'ঘাইরাত (জিল) নাং-ওয়া-নামোস' (পরিবারের, বিশেষ করে নারীদের, এবং সম্পত্তির সুরক্ষা) অথবা 'ইজ্জাত-ওয়া-আব্রো (সম্মান, সামাজিক মর্যাদা) এর চরম হানি হয়েছে। আর অন্যদিকে বেশিরভাগ রোহিঙ্গা জানিয়েছে যে তারা তাদের মর্যাদা পূর্ণরূপে খুইয়েছে। আর সাথে হারিয়েছে জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি, ভূমি ও এমনকী যৌন অধিকারও।

মর্যাদার সংজ্ঞায়ন

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য আফগানিস্তানের IDP ও বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীরা তাদের জীবনের যাপিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কীভাবে 'মর্যাদা'র সংজ্ঞায়ন করে সেটা বুঝতে চেষ্টা করা। Patrick & Simpson (2019) এর প্রথাগত 'top-down' রীতি এক্ষেত্রে প্রায়ই 'ক্ষতিগ্রস্থে'র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মর্যাদা (ও মর্যাদা হারানো)-এর গুরুত্ব, অভিজ্ঞতা ও ধারণায়নকে আমলে নেয়না। এই গবেষণায় সেটি এড়িয়ে গিয়ে বরং বাস্তুচ্যুত মানুষের নিজস্ব ধারণায় সুন্দর, মর্যাদাপূর্ণ ও কল্যাণকর ভবিষ্যতের যেই স্বরূপ তার ওপর সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

স্থানান্তর ও নির্যাতনের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে IDP ও রোহিঙ্গারা মর্যাদাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়ন করে। যেমন, IDP রা সুনির্দিষ্টভাবে মর্যাদার ব্যবচ্ছেদ করেছেন নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে:

- মৌলিক চাহিদার প্রাপ্তি (খাবার, পানি ও বাসস্থান);
- স্বচ্ছলতা ও সম্পদ;
- স্বনির্ভরতা ও আত্ম-পর্যাপ্ততা;
- জীবন, বাসস্থান ও পরিবারের সুরক্ষা;
- শান্তি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা;
- স্বাধীনতা ও অধিকার;
- পারস্পরিক সম্মান ও সহানুভূতি;
- ধর্ম ও ইসলামিক মূল্যবোধ; এবং
- শিক্ষা

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থিরাও মর্যাদার এক কাছাকাছি ও জটিল সংজ্ঞায়ন করে। তাদের বর্ণনায় যেই বিষয়গুলো উঠে এসেছে:

- নিরাপত্তা
- পরিচয়
- ধর্ম
- জ্ঞান, শিক্ষা (ইল্‌ম)
- সম্পদ, স্বনির্ভরতা ও আত্ম-পর্যাপ্ততা
- একাত্মতা ও পারস্পরিক সম্মান

আমাদের বিতর্ক হলো, তাদের মর্যাদার সংজ্ঞায়ন স্পষ্টতই হয়েছে একটা দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের ঘরবাড়িতে থেকেও অত্যাচার ও হেনস্থার শিকার হবার কারণে। আফগান ও রোহিঙ্গার পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারও প্রভাব রয়েছে এতে। আমাদের প্রতিবেদনে IDP ও রোহিঙ্গাদের মর্যাদার সংজ্ঞায়নে কিছু সাধারণ বিষয় চলে এসেছে, যেমনঃ

- নিরাপত্তা; এবং অত্যাচার ও যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষা
- সহানুভূতি, একাত্মতা ও পারস্পরিক সম্মান
- সম্পদ, স্বচ্ছলতা ও স্বনির্ভরতা

- জ্ঞান ও শিক্ষা (ইল্‌ম)

IDP ও রোহিঙ্গাদের মর্যাদার সংজ্ঞায়নের সামঞ্জস্যের বাইরেও, তাদের বর্ণনা ও ধারণায়নে মর্যাদার যেসব পার্থক্য উঠে এসেছে—সেগুলোও এই গবেষণায় চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে, শান্তি ও নিরাপত্তা, পরিচয়, স্বাধীনতা ও অধিকার; এবং আশ্রয়, খাদ্য ও মৌলিক চাহিদা (বিস্তারিত অধ্যায় চার-এ)।

বাস্তুচ্যুতি ও মর্যাদার যে সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান , এই গবেষণার তত্ত্ব-উপাত্ত তারই ধারাবাহিকতা (দেখুন Holloway and Fan, 2018; Kandiwall, 2019)। যদিও মর্যাদার সামাজিক, ধার্মিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো (দেখুন Holloway and Fan, 2018) এক্ষেত্রে কার্যকরী, এই গবেষণায় আলাদা করে উঠে এসেছে, মানুষের নিরাপত্তা (যৌন নিরাপত্তা সহ), পরিচয়, একটা শান্তির জীবন যাপনের ইচ্ছা; জ্ঞান ও শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা; পর্যাপ্ত আবাসস্থল ও মৌলিক চাহিদার প্রয়োজনীয়তা; এবং স্বাধীনতা/মানবাধিকার— এর সবগুলো প্রপঞ্চই মর্যাদার ধারণায়নের চাবিকাঠি।

অন্যদিকে, মানবিক সংস্থাসমূহ এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা মূলত মর্যাদার সংজ্ঞায়ন করেছেন সম্মান ও মানবাধিকারের দিকে চোখ রেখে। শিক্ষার গুরুত্ব, স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা এবং প্রাপ্যতার গুরুত্বের দিকে বেশি নজর দেয়া হয়নি। এর ব্যাখ্যা হতে পারে যে, মানবিক সংস্থাসমূহ মূলত প্রথাগত top-down রীতির ওপরেই নির্ভরশীল (Patrick and Simpson, 2019)। ক্ষতিগ্রস্থ সমাজের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণা বা উপাত্ত সংগ্রহে গুরুত্ব দেয়া হয়নি (Grandi, Monsour and Holloway, 2018)। স্পষ্টতই, IDP ও রোহিঙ্গারা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা, সমাজ ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মর্যাদার সংজ্ঞায়ন করেছে এবং দুইপাশের সংজ্ঞায়নের এই পার্থক্যের দরুণ মানবিক সংস্থার কার্যক্রমও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

<u>সাহায্যের বন্দোবস্ত</u>

IDPদের বেশিরভাগই মানবিক সাহায্যের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট। তাদের মতে সাহায্য ছিল অপ্রতুল এবং তাদের প্রকৃত প্রয়োজনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যাদের সহযোগিতা পাবার কথা তাদের অনেকেই পাচ্ছে না, এবং কিছু নাজুক জনগোষ্ঠী যেমন, অচল, বিধবা ও অতিদরিদ্র মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে পায়নি। এছাড়াও, অনেক IDPর মতে, সাহায্য বন্টনের প্রক্রিয়ায় তাদের ইজ্জত রক্ষা হয়না— বিশেষ করে বিশৃঙ্খল পরিবেশ, আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি নজর না দেয়া, স্টাফদের দুর্ব্যবহার এবং দুর্নীতিই এর কারণ। ভুক্তভোগীদের অনেকেই নানা রকম ভয়-ভীতির কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ করতে অনিচ্ছুক।

বাংলাদেশী ক্যাম্পের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বেলায়, মানবিক সংস্থাগুলো মনোযোগ দিয়েছে খাদ্য, পানি, আবাস, নিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতার ওপর। মানবিক সংস্থার কর্মীরা মনে করেন রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে মৌলিক চাহিদাগুলো তাঁরা মিটিয়েছেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা রোহিঙ্গাদের প্রতি নম্র ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিছু কর্মী যখনই পেরেছেন রোহিঙ্গাদের ভাষা ব্যবহার করেছেন।

তাদের নিজস্ব বাচনভঙ্গি ব্যবহার করে সম্বোধন ও কুশলবিনিময় করেছেন যাতে তারা মনে করে যে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এভাবে কাজ করা খুবই জরুরি বিশেষ করে যখন কর্মীরা তাদেরকে আধুনিক চিকিৎসার উপকারিতা বা পরিচ্ছন্নতা, যেমন ঋতুস্রাবের কাপড় ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝানোরও চেষ্টা করেছে (Farzana, 2017)। তাছাড়া যখন খুব নাজুক কোন জনগোষ্ঠীকে সাহায্য গ্রহণে রাজি করানো দরকার তখনও এ পদ্ধতি খুব কাজে আসে (Akhter and Kusakabe, 2014)। তা সত্ত্বেও, গবেষণাদলগুলো এটি বুঝতে পেরেছে যে, এখনো এ ধরনের উদ্যোগে উন্নতি করা সম্ভব, আর সে ব্যাপারে তারা সচেষ্ট। যেমন, WFP তাদের খাদ্য অপশন ৩ থেকে ১৯ এ উন্নীত করেছে কিন্তু তারা মনে করে যে মোটের ওপর যা দরকার তা তারা করতে পেরেছে। কিছু আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক এনজিও অনুধাবন করেছে যে রোহিঙ্গাদের জন্য শিক্ষা খুব জরুরি, এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা তারা ধরতে পেরেছে। কষ্টসাধ্য হলেও তারা চেষ্টা করেছে বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সাথে সমঝোতা করে রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে (HRW, 2019)। আরো একটি ব্যাপারে মানবিক সংস্থার কর্মীরা ভয়ে ছিলেন যে, একসময় আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর থেকে আসা ত্রাণ সরবরাহে ঘাটতি পড়বে এবং এতে করে পর্যাপ্ত সহযোগিতায় অনেক ভাটা পড়বে। তারা বুঝতে পারছে যে, রোহিঙ্গারা ক্রমশ একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে, বিশেষ করে যদি তাদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম এভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে।

ভবিষ্যতের সমাধান

যেহেতু আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতির জন্য যুদ্ধ ও সংঘর্ষকেই সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, স্বভাবতই শান্তিপ্রতিষ্ঠাকে মনে করা হয় একটি মর্যাদাপূর্ণ সমাধানের পূর্বশর্ত। সে শান্তি অধরাই থেকে যায় এবং মানবিক সংস্থাগুলো নানামুখী প্রচেষ্টার মাধ্যমে টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছে। IDP রা নিম্নোক্ত দশটি ক্ষেত্রে সহায়তার আবেদন জানিয়েছেঃ

১) ভূমি ও আশ্রয়ের সরবরাহ, সাথে পানি, নিষ্কাশন ও এনার্জির সরবরাহ (SDG লক্ষ্যমাত্রা 1.4, 6.1, 6.2, 7.1, 11.1, 11.3);

২) ক্লিনিক, স্কুল এবং দক্ষতা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নির্মাণ (SDG লক্ষ্যমাত্রা 1.4, 3.8, 4.a, 7.1, 9.1, 11);

৩) রাস্তা, কারখানা এবং পাওয়ার স্টেশন নির্মাণ (SDG লক্ষ্যমাত্রা 7.1, 9);

৪) ঘরবাড়ি মেরামত, রাস্তা, ভূমি, সুপেয় পানি ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা (SDG লক্ষ্যমাত্রা 6.1, 6.2, 7.1, 9.1, 11.2);

৫) কৃষি বিষয়ক সহযোগিতা (SDG লক্ষ্যমাত্রা 1.4, 2.3, 2.4, 2.a, 9.3);

৬) শিশুদের শিক্ষা (SDG লক্ষ্যমাত্রা 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7);

৭) কাজের সুযোগের বন্দোবস্ত (SDG লক্ষ্যমাত্রা 2.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5);

৮) ব্যবসার মূলধন জোগারে সহায়তা (SDG লক্ষ্যমাত্রা 8, 9.2, 9.3);

৯) দক্ষতার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ (SDG লক্ষ্যমাত্রা 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.5);

১০) শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা (SDG লক্ষ্যমাত্রা 5.5, 11.1, এবং পুরো লক্ষ্য নং 16 কিন্তু বিশেষ করে 16.1, 16.2, 16.3)

রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে, এই চলমান বিবাদ এবং নিকট ভবিষ্যতে কোন মর্যাদাপূর্ণ সমাধানের ভরসা না থাকায় শরণার্থী, বাংলাদেশ সরকার ও মানবাধিকারকর্মীদের মাঝে হতাশা বিরাজ করছে। সমস্যাটা আরো বেশি প্রকট কারণ:

- এটি একটি নির্ভরশীলতার সংস্কৃতি তৈরি করছে যা তাদের মান-সম্মানকে আরও আহত করে। তারা বরং স্বনির্ভর হতে চায়;
- স্থানীয় মানুষ মনে করছে তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে;
- স্থানীয় পরিবেশ ও বন-প্রকৃতির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে এবং এতে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির আশঙ্কা আছে;
- সাহায্য-সহযোগিতার পেছনে অর্থের যোগান ক্রমেই কমছে।

এর সব কিছু এই ইঙ্গিত করে যে একটি স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুব জরুরি। এই সমস্যার সব রকম অংশীদার— যেমন রোহিঙ্গা শরণার্থী, বাংলাদেশ সরকার, দাতা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো— তারা সবাই একমত যে এক্ষেত্রে একটিই স্থায়ী সমাধান আছে; আর তা হচ্ছে, রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় নিজেদের আবাসভূমি মায়ানমারের রাখাইনে ফেরত যাবে মায়ানমারের নাগরিক হিসেবে। কিন্তু এক্ষেত্রে একমাত্র প্রতিবন্ধকতা মায়ানমারের সরকার নিজেই।

উন্নয়নের সহযোগিতা হিসেবে রোহিঙ্গাদের দাবী যেসব বিষয়ে তা হল:

- রাখাইনে ভূমির সরবরাহ এবং দীর্ঘস্থায়ী বাসস্থানের যোগান। সাথে পানি, নিষ্কাশন ও শক্তির সরবরাহ যাতে করে তারা নিজেরা নিজেদের সমাজ নতুন করে গড়ে তুলতে পারে (SDG লক্ষ্যমাত্রা 1.4, 6.1, 6.2, 7.1, 11.1, 11.3);
- হাসপাতাল/ক্লিনিক নির্মাণ (বা ইতোমধ্যে যেসব ক্লিনিক বিদ্যমান সেখানে প্রবেশাধিকার), স্কুল, প্রশিক্ষণকেন্দ্র নির্মাণ SDG লক্ষ্যমাত্রা 1.4, 3.8, 4.a, 7.1, 9.1, 11);
- ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবকাঠামো এবং জীবনধারণে দরকারি যা কিছু আছে তা পুনর্নির্মাণ, যেমন—রাস্তা, কারখানা এবং পাওয়ার স্টেশন (SDG লক্ষ্যমাত্রা 7.1, 9);
- বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ (যেখানে দরকার নতুন করে, অথবা মেরামত করা), ভূমি, সুপেয় পানি ও নিষ্কাশন (SDG লক্ষ্যমাত্রা 6.1, 6.2, 7.1, 9.1, 11.2);

- কৃষি বিষয়ক সহযোগিতা (SDG লক্ষ্যমাত্রা 1.4, 2.3, 2.4, 2.a, 9.3);
- শিশুদের জন্য শিক্ষা (SDG লক্ষ্যমাত্রা 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7);
- কাজের সুযোগ তৈরি (SDG লক্ষ্যমাত্রা 2.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5);
- ব্যবসার মূলধনের ব্যবস্থা করা (খামার, দোকান ও অন্যান্য স্থানীয় ব্যবসার পাশাপাশি নতুন ধরনের ব্যবসায় উদ্যোগ) (SDG লক্ষ্যমাত্রা 8, 9.2, 9.3);
- দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (প্রথাগত কাজ বা নতুন কাজের জন্য) যাতে করে তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান করতে পারে (SDG লক্ষ্যমাত্রা 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.5);
- শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও রাখাইনে নিরাপদ পরিবেশের যোগান (SDG লক্ষ্যমাত্রা 5.5, 11.1, এবং পুরো লক্ষ্য নং 16 কিন্তু বিশেষ করে 16.1, 16.2, 16.3)

নীতিনির্ধারকদের জন্য সুপারিশ

গবেষণায় যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীরা তাদের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নিজেরাই সমস্যা ও সংগ্রাম মোকাবিলার মাধ্যমগুলো চিহ্নিত করতে সক্ষম। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে আমরা নীতিনির্ধারণের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো পেশ করলাম।

আফগানিস্তানের *IDP* দের জন্য

মর্যাদার top-down (উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া) সংজ্ঞায়নের ওপর ভরসা না করে মানবিক সংস্থাগুলোর কর্মীদের বুঝতে চেষ্টা করা উচিত, ভুক্তভোগী সমাজ মর্যাদা বলতে কী বোঝে এবং তাদের নিজস্ব ধ্যানধারনা অনুযায়ী মর্যাদা রক্ষায় কী কী করা উচিত।

মানবিক সংস্থাগুলোকে আরও সময়োপযোগী ও সংগতিপূর্ণ সংঘর্ষ মীমাংসার পথ বের করতে হবে। সাথে আফগানিস্তানের খরা ও অন্যান্য দুর্যোগে ঘন ঘন সহযোগিতা এবং যথেষ্ট দানের ব্যবস্থা করতে হবে যেন অন্তত তাদের নিত্যদিনের চাহিদাগুলো মেটে আর তারা ওইসব এলাকা থেকে স্থানান্তর না করে।

শিক্ষার দিক থেকে বিশেষ নজর দেয়া লাগবে মেয়েদের শিক্ষায়, যারা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে পারেনা।

IDP দের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দেয়া জরুরি, বিশেষ করে যুদ্ধ সংঘর্ষের ভুক্তভোগীরা আর শিশুরা এক্ষেত্রে উপকৃত হয়।

মানবাধিকার কর্মীদের উচিত নাজুক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে বিধবারা যেন আর্থিক সহায়তা নির্বিঘ্নে পেতে পারে। স্থানীয় রীতিনীতি মাথায় রাখতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, একাকী নারীরা আরও বেশি করে লিঙ্গ-বৈষম্যের শিকার এবং সাথে যৌন নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হতে পারে যদি তারা একলা বাড়ির বাইরে যান।

মোটকথা, আফগানিস্তানে শান্তি থাকতে হবে এবং যুদ্ধ-সংঘর্ষের মীমাংসা হতে হবে।

বাংলাদেশে অবস্থানরত বলপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য:

মর্যাদার top-down (উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া) সংজ্ঞায়নের ওপর ভরসা না করে মানবিক সাহায্য-সংস্থার কর্মীদের বুঝতে চেষ্টা করা উচিত ভুক্তভোগী রোহিঙ্গা সমাজ মর্যাদা বলতে কী বোঝে এবং তাদের নিজস্ব ধ্যানধারনা অনুযায়ী মর্যাদা রক্ষায় কী কী করা উচিত।

খুব দ্রুত শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত এবং উপযুক্ত শিক্ষাসনদ নিশ্চিত করাও জরুরি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক্ষেত্রে দ্রুত সমাধান জরুরি।

কর্মসংস্থান আরও বাড়াতে হবে, এমনকি তারা ক্যাম্পে বাসরত থাকলেও। কেননা এতে করেই কেবলমাত্র তারা স্বনির্ভর হতে পারে, যা তাদের 'মানসম্মান' রক্ষার জন্য দরকার।

ক্যাম্পের ভেতর নারীরা যদি ঘরের বাইরে কাজ করতে চায় এবং এতে করে তাদের মর্যাদা বাড়ে সেক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করতে হবে। স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মানানসই উপায়ে তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যেন নিজেরাও উপলব্ধি করে কেন নারীদের বাইরে কাজ করার স্বাধীনতা দরকার। সম্মানজনক শিল্প-কারখানায় তাদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে (তার মাঝে কিছু কিছু শুধু নারীকর্মী নিয়োগ দিলেও চলবে)। এই মুহূর্তে এটি খুবই দরকার কেননা অনেক অনেক রোহিঙ্গা শরণার্থী নারীপ্রধান পরিবারে বাস করছে।

কর্মসংস্থানের আরও যোগান প্রয়োজন। কারণ তাদের নিজ উদ্যোগে অর্থ উপার্জন ও জীবনের মানোন্নয়ন প্রয়োজন। নিজেদের কি কি দরকার, কোন খাদ্য বা পণ্য কিনতে যদি চায়, তা তারা যেনো নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

রোহিঙ্গাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দেয়া জরুরি— বিশেষ করে যুদ্ধ সংঘর্ষের ভুক্তভোগিরা আর শিশুরা এক্ষেত্রে অধিক উপকৃত হবার সুযোগ রয়েছে। আরো বিশেষ সহায়তা দেয়া দরকার নারীদের জন্য। যেসব নারী মনে করেন যৌন নির্যাতনের দরুন তাদের 'ইজ্জত' এর ওপর আঘাত এসেছে, তাদের আরো বেশি সহায়তা প্রয়োজন।

কক্সবাজারে কর্মরত মানবিক সংস্থাসমূহ ও সরকারি সংগঠনগুলোকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নারী-শিশুরা মানবপাচারকারী বা অন্য সুযোগসন্ধানীদের শিকার না হয়।

পয়নিষ্কাশনের মাধ্যম আরো উন্নত করতে হবে যেন বৃষ্টির দিনেও ক্যাম্পে খোলা পাইপ না থাকে।

দীর্ঘমেয়াদে রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্ব ও পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদানের পরিকল্পনা থাকতে হবে, বিশেষত মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে। সেটা সম্ভব না হলে অন্য কোন রাষ্ট্রে।

যেখানেই তারা স্থায়ী আবাসস্থল পাবে সেখানেই তাদের প্রয়োজন—

- নাগরিকত্ব
- শান্তি ও নিরাপত্তা। যা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বাহিনী দরকার;
- শান্তি ও সংঘর্ষ মীমাংসার একটি পদ্ধতি;

- এবং একটি টেকসই ভবিষ্যতের জন্য যা যা জরুরি;

আর সবশেষে বলতে হয়, বাংলাদেশ সরকার ও এর জনগণ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে যা করেছে, তা বিবেচনায় কক্সবাজারের স্থানীয় সমাজের টেকসই উন্নয়নের জন্যেও দাতা সংস্থাগুলোর এগিয়ে আসা উচিত। যাতে করে তারা কোন দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির সম্মুখীন না হয় এবং বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রাও বাধাপ্রাপ্ত না হয়।